KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল.-৯
Collection : KLMLGK	Publisher : (১/২) গোবিন্দ সুন্দর ধর, অতিরিক্ত সত্তাধর (১/৪, ৫)
Title : অত্বর (ATWAR)	Size : ৪.৫" / ৫.৫"
Vol. & Number : 1 2 1/4 5	Year of Publication : ১৩৭২ (প্রথম সংকলন) ১৩৭৬ (দ্বিতীয় সংকলন) ১৩৭৬ (কার্তিক) ১৩৭৪ (চতুর্থ সংকলন)
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অত্বর সম্পাদক (১)(২) শ্যামসুন্দর ধর, শুভঙ্কর ঘোষ (১/৪) অতিরিক্ত সত্তাধর, শুভঙ্কর ঘোষ (৫)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শ্রীরামপুর লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংকলন

অত্বর

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রদীপ বিশ্বাস
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
অভিজিৎ সরকার
শ্যামসুন্দর দত্ত
স্বপনকুমার চক্রবর্তী
অমিতাভ গুপ্ত
শুভঙ্কর ঘোষ
সুভাষ দাস
অর্পিতা রুদ্র
অনিল আচার্য
অসিত দাস
স্বপন দাস
নারায়ণ ভট্টাচার্য
রঞ্জিত রায়চৌধুরী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অম্বর
কবিতা পত্রিকা
প্রথম সংকলন
তেরশো বাহাত্তর

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
সুশান্ত কর্মকার

প্রকাশক :
গৌরাঙ্গসুন্দর দত্ত
অন্তরপর্ষদের পক্ষ থেকে

মুদ্রক :
অজিত কুমার দত্ত
বাইশের এ বৃন্দাবন বোস লেন
কোলকাতা ছয়

অন্তর-দপ্তর :
সাতষোটির দুই মহাত্মা গান্ধী রোড
কোলকাতা-নয়

কিছু বলার জন্যেই বলা নয় ॥

বাংলা সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে কবিতাকে পৃষ্ঠাবৃদ্ধি ও পাদপূরণের মর্যাদা (!) দেওয়ার এটিকেট (!) এখনো নির্বিবাদে চালু রয়েছে—নইলে দাক্ষিণ্যভরে সাকুল্যে দুটি কি তিনটি পৃষ্ঠা পৃথকভাবে কবিতার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে—(বাংলাদেশের প্রধানতম দুটি সাপ্তাহিকে তো একটি পৃষ্ঠা-বরাদ্দ) এরই অভিমানভরা প্রতিবাদে এককালে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা পত্রিকা' প্রকাশ করেছিলেন—এবং প্রায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে উন্নাসিক বিদগ্ধ মহলকে কিছু টাটকা জবাব, টোটকাজাতীয় কিছু প্র-শিক্ষা, কাব্যরসিককে কিছুটা আনন্দ এবং কবিতাকে অনেকটা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন—তাঁরই প্রেরণায় কবিতা পত্রিকার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নিলেন পরবর্তী তরুণেরা। জন্ম নিল 'কৃত্তিবাস,' 'শতভিষা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতার পত্রিকা। কিন্তু কবিতার সংগে তাল মিলিয়ে চলল না 'কৃত্তিবাস'—কবিতার বাঁশী বাজাতে বাজাতে গল্পের ডুগিতব্‌লা ধরল—বৈষয়িক ও অর্থপূর্ণ (!) উৎসাহে—শারদীয় তেরশো বাহাত্তর সংখ্যাটি তাই কবিতার সংগে ক্রোড়পত্রের ধ্বজা ধরে গল্পের কালি ছিটোলো। আমরা দুঃখ পেলাম। অর্থের (money) কাছে কবিতা আমল পায় না ব'লে অর্বাচীন গল্পকে কবিতা পত্রিকায় আসন দেব—এ আত্মঘাতী ভাব 'কৃত্তিবাসে'র ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করল।

অন্তর অর্থে (money) উৎরোবে না হয়ত—কিন্তু কবিতার অর্থে আসন গাড়বে—নোতুন কিছু দেবে যা পূর্বতনের

ভুলকে ভাঙবে—একঘেয়েমিকে মুছবে—গ্রহণযোগ্যকে নেবে—এবং আগামীকালের জন্যে কিছু স্বাস্থ্যবান মশলা বানাবে।

অন্তরের লক্ষ্য—কবিতার বলিষ্ঠ কথাশরীর, আংগিকের স্বতন্ত্র স্বাদে পুষ্ট আটপৌরে রূপ, অভিনবত্বের প্রেক্ষিত—যা যে কোনো কবিমনকে, মনোগত কবিকে, কবিতারসিককে রসিক কবিকে এবং মননজীবী মহলকে কিছুটা ভাবিয়ে তুলবে এবং অন্তরের এও ইচ্ছে, এর ফলে তার দপ্তরে প্রত্যেকের সুস্থ পরামর্শের চিঠি আসুক—(প্রতিবাদমূলক কিংবা প্রস্তাবমূলক)। যেহেতু অন্তরের মানসিকতা প্রত্যেকের প্রতি উৎসাহিত ও অভিনিবিষ্ট।

গড্ডল চলমানতায় অন্তর উজ্জ্বল আঘাত বিশেষ।

সময়ের হাতে পত্রিকার ধারাবাহিকতা ছেড়ে দিয়ে 'অন্তর' এটুকু অন্তত দৃপ্তকণ্ঠে জানাতে চাইছে—'অন্তর' অকৃত্রিম কবিতা পত্রিকারূপেই তার সার্থকতা প্রতিপন্ন করবে।

বানান প্রসংগে অন্তর কবির ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও প্রবণতার গণ্ডীতে পা বাড়াবে না।

'অন্তর' প্রসংগে যাবতীয় চিঠিপত্র, কবিতা বিষয়ক আলোচনা, কবিতা ইত্যাদি পাঠাতে হলে অন্তর-দপ্তর, সাতষোটির দুই-মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-নয়—এই ঠিকানার প্রতি নজর রাখতে হবে।

'কিছু বলার জন্যেই বলা নয়'—অন্তর-পর্ষদের সওয়াল-জবাব। বিভাগটি প্রত্যেক সংখ্যাতেই অন্তত কিছু ভাববার কথা বলবে।

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সাম্প্রতিক উক্তির অনুসরণে ॥

আর কিছু যদি না হয়তো বেশ
মোটা দেখে, বাচ্চা বয়সে
একটা দোতলা বাস কিনবো।
বোকা হাতীর বাচ্চার মত খাইয়ে
দাইয়ে ঝড় করে ছেড়ে দেব
আর বলবো : লক্ষ্মী আমার
সোনা আমার, লক্ষ্মী বোঁচা আমার।

ঝক্‌ঝকে এলমুনিয়ামের শাড়ীতে জড়ানো
মুগ্ধা-ওয় শরীরে আমি আমার মুখ
ঘসবো আর সজোরে যাবার সময়
হাত নাড়া দিয়ে বলবো : এই দেখনা,
আমাদের জীবনে প্রেম, জীবনে প্রেম
আমাদের—

আর একথা
বলতে বলতে থেমে যাব, আর হাতল
ধরে বুকের পরে ঝুঁকে পড়ে বলবো :
এই ধরুন না যেমন, রাজনীতি—

আর শেষকালে
অধোমুখে কিছুই যদি না পারি তো,
বেজায় কালো দুটো ষাঁড়ই কিনবো আর
সামনে নিজেকে যুতে দিয়ে জুতিয়ে
কবিতা লিখে যাব, নির্ভেজাল আধুনিক,
হাংরী জেনারেশনের জন্য।

প্রদীপ বিশ্বাস

॥ আর এক জীবন ॥

আবার নক্ষত্রের প্রতীক
হই। চার হাতে কলঙ্কের
বৃত্তটাও ভেঙে দিই তারপর—
মাতাল ঘূর্ণিটার গজদাঁত
তুলে ওপারে চলে যাই।

যখন এতই সন্দেহ গা
বেয়ে টুপছে, চোখের মাস্তুল
আর ওদিকে তুলবোনা ;
কুড়িটা আঙুল দিয়ে প্রেতাত্মা
আঁকব—ওদের প্রেতাত্মা
কেবল আঁকব—আঁকব।

ততক্ষণে ওরা নিজেদের
দেখুক, কাঁপুক বাদলা পোকার
ডানায় অনন্তকাল ধরে কাঁপুক।

অবশেষে ঝরতে ঝরতে
কালচিটে ভাবনা যত পঙ্গু
মেঘের মত কাৎরাক,—
সন্দেহের মাকাল 'ফল'গুলোর
হোক পুনর্বাসন।

ততক্ষণ অন্ধ এ অলিন্দের
ফোকরে ছিঁড়ে রোদ্দুরে, দৃশ্যপটে
চলে যাই।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ ভ্রমণ কাহিনী ॥

কতক্ষণ ধরে বাসটা চলছিল—কতক্ষণ,—কতক্ষণ
বাইরে চলচ্চিত্র দ্রুত সরে যায়—মহানগর-গ্রাম—অবশেষে
পথের পাঁচালী।

মনে করতে পারছি না পকেটে চিরুণী আছে কিনা ; এলোমেলো
হাওয়া চুলগুলো উড়িয়ে দিলো
প্রসাধন শেষ সব, সে কি চিনতে পারবে ?
সে কি চিনতে পারবে ?

উঁচু নীচু রাস্তায় বড় কষ্ট হয় ঝাঁকুনীতে, গর্ভিণী মস্তিষ্ক
যাবতীয় জ্ঞান, শিক্ষা-নীতি—রাজনীতি, আড্ডার ঝাঁঝালো
স্বাদে।

কতক্ষণ ধরে বাসটি চলছিল, চমক ভাঙ্গলো যখন
লোকটা টিকিট চাইলো।

দু'স্টপেজ বাদ দিয়ে বললাম—লোকটা হেসে পয়সা
না নিয়ে টিকিট গুঁজে দিল হাতে।

দেখি তাতে বড় বড় হরফে "মৃত্যু" ছাপা আছে ভাড়ার বদলে।
কণ্ডাক্টারটাকে কে যেন 'ভগবান' বলে ডেকে
উঠলো

হঠাৎ এ্যাকসিডেণ্ট—কালো যত কিছু ; বাইরে 'অপরাজিত'র
পোস্টার

চুরি ক'রে দেখে নিলাম। এরপর আমি—আমি
বিশ্বাস করুন—বৈতরণীতে নৌকায় পার হচ্ছি।

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

॥ এই পৃথিবী ॥

পাত্রে নাও শুধু নির্ভেজাল জল ভরাট ক'রে
পান ক'রে দেখ তার এক বিন্দু
পাবে না কিছুই।
তারপর
আকাশের নীল রং আর বনানীর শ্যামলতা
মেশাও সেই জলে
এখানকার
হাসি-কান্না-জ্বালা-যন্ত্রণাও থাকুক তার মাঝে।
এবার তোমার আর আমার মুখ
সহযোগিতা করুক
এসো
পান করি সেই বর্ণালী একপাত্র জল।

অভিজিৎ সরকার

॥ জরাসন্ধ অ-জোড়ে বাঁচুক ॥

খড়ি দিয়ে আঁকা এ জন্মের
মাঝের কিছুটা মুছে দিলে মন্দ নয়!
জরাসন্ধ অ-জোড়ে বাঁচুক—
কিছু ভেল্কি দেখাক
বা কিছু আরো পাপ করে
মহৎ হোক!

আগের ভুল-ভ্রান্তি-অপরাধ—
কিছুরই হিসেব থাকবে না
পরের ধড়েতে।

জরাসন্ধ অ-জোড়ে বাঁচুক
তা না হলে যৌবনকে
অহেতুক প্রশ্রয় দিয়ে
কিছু স্বপ্ন আর
কিছু ভালোবাসার রস দিয়ে জুড়ে
ধড় দুটোকে ঠেলতে হয় যমের দপ্তরে—

অ-জোড়ে বাঁচলে
মরাটাই বাঁচা না বাঁচাটাই মরা—
সব অদ্বয়-অভেদ!!

শ্যামসুন্দর দত্ত

॥ জেনারেশনের গতি, আমি উদ্‌গ্রীব ॥

পশ্চিমের স্রোত বাঁক খেতে খেতে
কেবলই আমাদের শহরে
ভীড় করে
রোজই বিলিতি উৎসব চলছে
চা-চা-চা অথবা
টুইস্টে।

ওখানে শুধু কান্না চেপে পোষাকী নৃত্য
ওখানে নিঃস্ব ছদ্মবেশী
মাদক ঘূর্ণী—

হেঁদুয়ার রোদ্দুরে পোড়া উচ্চরোলে
অকস্মাৎ ঃ
'অসিত, অসিত'
কিন্তু উত্তর কে দেবে! ভাবি বলি
আত্মহত্যা করেছে বেচারা দায়ে পড়ে

ওরা শ্যামুর চোখে কান্না খুঁজবে
মস্ত ভ্রমে

সৃষ্টির বীজ সংগ্রহ করেছি কিছু
অরণ্যে যাবো
উদ্যান বানাবো ডাকবাংলোর ছায়ায়
আকাশ চোঁয়ানো নীলের রহস্যে
তখনও
নিমন্ত্রণ থাকবে
হাংরি জেনারেশনের জন্যে।

জীবনের ছদ্মবেশটা সরিয়ে
উলঙ্গ স্বাবলম্বী
তৃষ্ণার্ত বলিষ্ঠ ঠোঁটে
চুমু দেবে
সৃষ্টির উত্তাপের বেদীর ওপর—
হাত বাড়িয়েই আছি
বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো বলে।

স্বপন কুমার চক্রবর্তী

॥ মৃত্যুর নিরিখে ॥

ফিলজফি যাই বলুক, আমি মৃত্যুকে বলি
অবুঝ উন্মা, যেহেতু
দিন দশেক আগে মৃত্যুর আঁচলে মুখ লুকোতে
দেখেছি আমার সাদা হাঁসটাকে
এবং,—
আদিগন্ত হৃদয় জুড়ে তন্নতন্ন করে
মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে
আকাশকে অভিশম্পাতের রঙে মাখাতে দেখেছি
ওর সদ্য-বিধবা
স্ত্রীকে, অর্থাৎ তোমাদের ভাষায়
যার পরিচয়—পোষমানা নিরীহ
মেয়ে-হাঁস রূপে
কিংবা
অযথা কাব্যি করলে বলা চলে
অবলা হংসী।
তোমরা যাই বলো এবং ওকে যে ভাবেই ছোলা ভিজিয়ে
খেতে দেওয়া যাক্‌না কেন—ও
কোন কালেই পাবেনা প্রাণের উত্তাপ
তোমরা সহজ ভাষায় যাকে 'যৌনতা' বলে আদর করো।
ফিলজফি যাই বলুক—হাঁসটা ওর মরদকে হারিয়ে
আজীবন কুড়োবে হারানো উত্তাপ····স্মৃতি···যৌনপ্রেম,
কিন্তু ওকি আর ডিম পাড়বে ?
প্রশ্নটা তোমাদের কাছেই রাখলাম।

অমিতাভ গুপ্ত

॥ সে ॥

দিগন্তপ্রসারিত নারীর শানিত হাত কেঁপে উঠছে বারবার, আমি জেনে
গেছি এই জীবনের অন্য নাম যৌন-যন্ত্রণা
চতুষ্কোণ পৃথিবীর তীব্রতম অন্ধকারপ্রিয়তায় যাকে
বসিয়েছি রানীর আসনে, যে আমাকে চুম্বক উপহার দেবে বলে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো
অবশেষে মিয়ে গেল পরিণামহীন সেই গহ্বরের দিকে

প্রেম ও পাপের মতো অবাস্তব অলংকারে শরীর সাজানো
জলের বিন্দুর মতো করতলে জন্ম-মৃত্যু দোলে
যখন যেখানে যাই—সুড়ংগে, শ্মশানে
সে আমার সাথে সাথে আসে।

ঘৃণা ছাড়া আর কোন্ ভালোবাসা দিয়ে তার প্রতিদান দেবো ?

শুভঙ্কর ঘোষ

॥ সামাল দেবার জন্যে ভূমিকা ॥

পাঁজরে বাদামী নেশা—স্বস্তি নেই।
স্মৃতি তবু বাহাদুর
ছলনার অথবা জয়ন্ত সন্তানের সুখে ভরাট নাগর
ইচ্ছাবোধের। আমাকে চলার পথে
পিছুটানে নানাডাক, মৃদুগুঞ্জন, কুশল সংবাদের জন্যে
ঠাট্টা, হাসি, শিহরণপ্লুত শীৎকার এবং
অরক্ষিত বেহুদো আহ্বান—'শুভ, শুভ, শুভঙ্কর, মিছে অভিমান
কমলারং দীপ্রধূসর যন্ত্রণার প্রতি! কাছে এসো, বুঝে নাও
হিসাবী জীবন।'

পাঁজরে বাদামী নেশা—স্বস্তি নেই।
তবু হায়
সুমুখের পথে অথবা পিছুটানে পরিশ্রুত দ্বিধা হাসে
সরে যাচ্ছি চেনা মুখ থেকে, ডুবে যাচ্ছি চেনা সংসার থেকে
অনেক গহীনে।
বেকার ভালোবাসা ঠোঁট বাঁকায় লবণাক্ত স্বাদে
তবুও ফুর্তি লোটে সময়ের কোলে
অভিজ্ঞ আবেগে। পারা যায়না দ্বৈত সংগীতের ইমন-কল্যাণ
নির্বিবাদে ঠাহর করতে—ইচ্ছে হয় জনতার জঠরে খুঁজি
নিঃসঙ্গতার। কিন্তু....

কিন্তু সংগ্রাম অতি ক্ষীয়মান হয়
আমার অবসাদে ভরা বাসনার ধূসর স্রোতে। বাবলাগাছের মুখে
চুমু খেয়ে
ক্লান্ত এক ফিঙে দোল খেয়ে গেল
'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু' যেহেতু হতভাগ্য
যৌবনের জ্যোতির্ময় কুয়াশায় মুখ লুকোতে চাই, মুখ লুকিয়ে
সবুজ ঘাসের মৃদু উত্তাপ পেতে চাই। অথচ আমি তো চাইনে কোনো
বাহাদুর স্মৃতি
ছলনার অথবা জয়ন্ত সন্তানের সুখে ভরাট নাগর
ইচ্ছাবোধের। আমাকে চলার পথে পিছুটানে নানা গুঞ্জন, প্রলুব্ধ
স্মৃতি,
ঠাট্টা, হাসি, শিহরণপ্লুত শীৎকার এবং
দূরান্তে নিহত প্রেমের বুকে সুনির্মিত নষ্ট জাদুঘরে
সান্ত্বনার নক্ষত্রবন্যায়
সূর্যস্নান প্রতিরোধের জন্যে
আমাকে ঘুষ দেয় নানা দৃষ্টি রংছুট অথবা রঙীন,—
সেহেতু লোকশ্রুতি লাসকাটা ঘরের মতোন
ষড়যন্ত্রের নম্রতায় মাখা
কেউটে মদের লোভে হৃদপিণ্ডের চোরকুঠুরীতে
বাদামী নেশা জাগে।

পাঁজরে বাদামী নেশা—স্বস্তি নেই।
আয়নায় আলোর লণ্ঠনে
বিবেক, তোমার মরা মুখ দেখেছি
তোমার মরা মুখের সোঁদা গন্ধ শুঁকে আমি পথ কাটছি
যেহেতু মাতাল

এবং মুচলেকা দিচ্ছি, সমাহিত চলমান রাখী ছিঁড়ে আমি
পরমাত্মীয় হবো নির্জনতার,
গুপ্তচর ডাকে ভরা 'শুভ, শুভ, শুভঙ্কর' থ্যাঁতলানো ফুলের মতোন
মুছে দিয়ে
ইচ্ছাকে সামাল দেব
আমার ললাটে আঁকব অহল্যার হাসি।

সুভাষ দাস

॥ স্বগতোক্তি ॥

অথচ আশ্চর্য দ্যাখো
আমার স্মৃতির কোনো সৌধ-সাধ নেই।
আমি আজ অনন্তর আত্মার আত্মীয় হ'য়ে
বাঁচাটাকে নিদারুণ নির্মমতা ভাবি
কিংবা কোমল সুখে ধুতরো এড়িয়ে
কামিনী গাছের ডালে সুখতারা হওয়া
অথবা রোদের ঠোঁটে চুমু চাখা-চাখি
এবং ফুলন্ত কোনো ফুলের হাসিকে।

ক্যানো না, প্রেম কে আমি একালীন ফ্রেমে-আঁটা
অশালীন ছবি ছাড়া কিছুই ভাবিনা
এবং থুৎনি আজ নড়েনা ত্যামন।

বিশল্যকরণী ছেড়ে কোনো এক শল্য যদি
বিষশূল হানে—
সুরা ব'লে মেনে নেবো অনায়াস সুখে,
তথাপি নরম হাসি হাসবো না আমি।

যেহেতু আমীর হওয়া সততঃই স্ববিরোধী
আমার সত্তার—
এ আমার অংগীকার ঃ
অমরতা ফুস্‌লে নিয়ে ফসিল হবো না॥

অর্পিতা রুদ্র

॥ অচেনা অভীপ্সা ॥

বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি সমস্ত আবর্জনা
মনে হয়। হৈ-চৈ, হাসি-গান, ঠাট্টা, সিনেমায়
নিকৃষ্ট আনন্দ। রেস্টুরেণ্টের পর্দাঝোলানো
কেবিনে সস্তাদরের প্রেম। সকালের খবরের কাগজ
আর সন্ধ্যার শাঁখ যেন একটা শক্ত দড়ি
দিয়ে বাঁধা জীবন !—রোমাঞ্চ নেই, অ্যাডভেঞ্চার নেই,
রোমান্সও নেই।

টেবিলের সংগে যেমন লাগানো ড্রয়ার
তেমনি জীবনের সংগে অধীনতা।
ড্রয়ারের মধ্যে স্বাধীনতা রেখে দিয়েছে ;
কিন্তু চাবি নেই তবু পালিয়ে যায় না,
কারণ স্বভাবটাই মরে গেছে।

ফুরিয়ে যাওয়া চায়ের কাপে সিগারেটের টুকরোগুলো—
নিঃশেষিত জীবনের পাত্র ভরা একঘেয়ে আবর্জনা।
ইন্‌টেলেকচ্যুয়লেরা ঐ ছাইয়ের তলায়
চাপা পড়ে যায়—ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে।
সমস্ত শহর আবর্জনায় ভরে উঠেছে।
সরাতে সরাতে বহুযুগ কেটে যাবে
বোধ হয়। নাকি খাতার লাইন ফুরোনোর মত
সেদিন সবকিছুই ফুরিয়ে যাবে ?

অনিল আচার্য

॥ কিম্ভূত ডেল্টা ॥

অমাবস্যা অন্ধকারে ঘোমটা-দেয়া আলো
আকাশমুখী বাংলা পাঁচ
বাইরে ব্ল্যাক-আউট,—বিভ্রাট।

ঠাকমা বললে,—
অচিনপুরের রাজকন্যে স্বাগতা
কোনো দিন দরজা খোলেনি
(নামকরণটা সার্থক !)
অবাঞ্ছিত আগন্তুকের ভয়ে।
একদিন দুগ্‌গো পুজোর বিষ্টি-ভেজা রাতে
ঘা পড়ল দরজায়,
মেয়েটার বুক উঠলো কেঁপে—
খুলল কপাট,
দেখল, মরচে-পড়া দেঁতো হাসি।

ছোট্ট মেয়ে 'বিউটি' বললে—
দাদুটা বোধ হয়।

অসিত দাস

॥ তিন থেকে জিরো, জিরো থেকে চার ॥

দেখছি তিন দিয়ে শুরু করলে
জীবন নামে এক পরমপিতা
জিরোর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে—
ভাবছি এবার
চার দিয়ে পা বাড়াবো
দেখা যাক জিরো পেরিয়ে
অঙ্কের কোঠায় ধাপে ধাপে
সিঁড়ি ভাঙা যায় কিনা।

কিছু যদি নাইবা হয়
তাহলে
অন্ততঃ তিন কিংবা চারের মধ্যিখানে
ত্রিশঙ্কু অথবা
শঙ্কাহীন হয়ে
আন্দোলিতই হবো।

স্বপন দাস

॥ অবশেষে অসাম্য···॥

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভগবান
আমরা তোমার মুখের দিকে তাকালাম
তোমার নীরব মুখের বাণী শোনার জন্যে
তুমি কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলে না
তাকিয়ে রইলে অনাদি অতীত প্রশান্তি নিয়ে
কোন সুদূর লক্ষ্যের দিকে পাকা তীরন্দাজের মতন।

আমরা কিন্তু পারলাম না আর
পাথর-কঠিন গাম্ভীর্য ধার করে তোমার সামনে
হাত জোড় করে অনিমেষ দাঁড়িয়ে থাকতে।
আমাদের সন্তান-সন্ততির দূরাগত ক্রন্দন
বার বার এসে কানে বিঁধতে লাগল তীব্র ভাবে
যেন ত্যক্ত নিয়োলথিক যুগের কান্না শুনছি বুকে
তাই প্রতীক্ষার সুউচ্চ বাঁধ এবার টলল
আমরা সদলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তোমার পদতলে
মাথা কুটে রক্তপদ্ম প্রণামি দিলাম তোমার চরণে
তোমারই প্রসাদ পাবার জন্যে।

তুমি কিন্তু এবারও তাকালেনা আমাদের দিকে
সেই শূন্য দৃষ্টি দিয়ে পুনর্বার ব্যঙ্গ করলে
মাটি কামড়ে পড়ে থাকা দ্বিপদ জন্তুগুলোকে, তাই
ব্যর্থ হয়ে আমরা মাথা তুললাম ভূমিতল হতে ;

আত্মরক্তে অভিষিক্ত হলো নির্ভীকতার রাজসিংহাসন।

এবারে মশাল জ্বেলে বেরিয়ে পড়লাম আমরা
অনাচার আর অত্যাচারীর খোঁজে,
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলাম কত গ্রাম কত জনপদ
কত ব্যাভিচারী জমিদারের প্রাকার ঘেরা বসত
হারিয়ে গেল ইতিহাসের কত নায়ক
কেউ তার হিসেবও রাখলে না—।

অবশেষে আমরা থামলাম ;
কে যেন আমাদের মাঝে রব তুলল
পাষাণ দেবতার গায়ে ফাটল ধরেছে হঠাৎ
অধীর উৎসাহে আমরা ছুটলাম সেদিকে
আমাদের আনন্দ আর বাধা মানল না
সংহত শক্তির প্রচণ্ড চাপে টুকরো টুকরো হল
পাথর কাটা অবয়ব
ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, রক্তবীজের বংশধরের মতন
.....কিন্তু ঐ পর্যন্তই।
মানুষগুলোর উপর আর নির্মম প্রভুত্বের
ছাপ আঁকতে পারল না বেচারা
বিশ্বপালক জগন্নাথ ঠুঁটো হয়েই রইলো
চির জীবনের মত—
অবশেষে অসাম্য , তোমার আত্মিক মৃত্যু হলো।

নারায়ণ ভট্টাচার্য

॥ কাঁচ ॥

মুখ দেখা আয়নার মুখে
দেখেছি অনেক মুখ
আমার একার,
সবুজ স্বপ্নভরা
ভৈরবী রাগে
ঝিঁ-ঝিঁ-ডাকা দুপুরের
আবহ সংগীতে

কিংবা
কখনও কোন আনমনা
বনলতা বিকেলের
পূরবী পঞ্চমে,
অথবা কখনও মেতে ওঠা
যুঁই চামেলীর ভীড়ে।

হঠাৎ
কাঁচ ভেঙে খান্ খান্
কায়া-ছায়া দূর—
তুমি আমি, আমি—আমি ঃ
প্রকৃতি নিঠুর,
কাঁচেরও মুখ আছে।

রঞ্জিত রায়চৌধুরী

॥ আজ রাত্রে ভালবাস ॥

আজ রাত্রে ভালবাস,
কাল ভোরে রক্তে গোলাপ ফুটিয়ে নিয়ো,
তিতিরের মত বিস্মৃতির নদীতে,
মুখ গুঁজে সাঁতার দিয়ো অথবা,
মনে মনে মৃত্যুর চিত্রকথা এঁকো।

আমাদের বাসরে সানাই আসেনি,
চারিদিকে ফুল দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি,
অন্ধকার দীর্ঘায়ত হতে নিরুৎসাহী হয়নি,
আমাদের বাসরে।

আমাদের ছবি নেই,
আমাদের এ বাহুল্য থাকবেই না,
যা কিছু লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত হৃদয়ে ভরা থাকবে,
আমাদের থাকবে দু' বুক ভালবাসা,
কাছাকাছি থাকার একটা খাট,
মাঝ রাত্রে হঠাৎ উঠে ছাখা
কিছুটা নিরিবিলি আকাশ।